বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত ছোটগল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত ছোটগল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান সৈয়দ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৯৮ এপ্রিল ১৯৮৯

চতুর্থ সংস্করণ অষ্টম মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0014-4

BANGLASHAHITTER NIRBACHITO CHHOTOGALPO [Vol. 2]
Selected short stories of Bengali literature
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Price : Tk. 100.00 only

বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলোকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্যে 'বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত ছোটগল্প' শিরোনামে একটি সঙ্কলন আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই সঙ্কলনের দ্বিতীয় খণ্ডে যে সব লেখকের গল্প সঙ্কলিত হয়েছে তাঁরা হলেন :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সুবোধ ঘোষ (১৯০৮— ?)।

সূচি

পুঁই মাচা ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

তেলেনাপোতা আবিষ্কার ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ২০

রস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৯

বন-জোছনা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪

অযান্ত্রিক ॥ সুবোধ ঘোষ ৫৮

পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়েই স্ত্রীকে বলিলেন— একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমনকি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন— কী হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটি? আহ্ ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন— তুমি মনে মনে কী ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল— ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন— কেন... কী আবার... কী—

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্তসুরে বলিলেন— দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি— ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, নাকি খোঁজ রাখ না? অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কী করে তা বলতে পার? গাঁয়ে কী গুজব রটেছে জানো?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— কেন? কী গুজব?

— কী গুজব জিজ্ঞাসা কর গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগ্‌দী দুলেপাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। সমাজে থাকতে হলে সেইরকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কী বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন— একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না— ও নাকি উচ্ছুগু করা মেয়ে— গাঁয়ের কোনো কাজে তোমাকে

আর কেউ যেতে বলবে না— যাও, ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলেবাড়ি বাগ্‌দীবাড়ি উঠে-বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন— এই! আমি বলি, না জানি কী ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর!— ওহ্!...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন— কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশিকিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কী? — আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।... হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন— হল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে বেড়ালে কী হবে, লোকের চোখ নেই? ... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন— না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কিদুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন; কিন্তু খিড়কিদুয়ারের একটু এদিকে কী দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন— এসব কী রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওহ্! এ যে...

চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ি ঢুকিল। তাহার হাতে একবোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে হল্‌দে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁইগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়েদুটির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড়মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো— বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখদুটো ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাচের চুড়িগুলো দু-পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড়মেয়েটির নামই বোধহয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল— চিংড়ি মাছ বাবা। গয়া খুড়ির কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে— তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুন দুটো পয়সা বাকি আছে। আমি বললাম— দাও গয়া পিসি, আমার বাবা কি তোমার দুটো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে— আর এই পুঁইশাকগুলো... ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে, নিয়ে যা... কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন— নিয়ে যা, আহা কী অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে.. পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু-দিন পরে ফেলে দিত... নিয়ে যা... আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন— ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হল না... যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ... ধাড়ী মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ির বাইরে কোথাও পা দিও না! লজ্জা করে

না এ-পাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চারছেলের মা হতে! খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন, আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ— ফ্যাল্ বলছি ওসব... ফ্যাল্।...

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন— যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো— যা, ফের যদি বাড়ির বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোটমেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোটমেয়ে অতবড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে-ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন— তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে... তুমি আবার ...বরং...

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোটমেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন— না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না— মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর-একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে! যা, যা তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়...

সহায়হরি বড়মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখদুটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাহার মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না। নিঃশব্দে খিড়কিদোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড়মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল— গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়িতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল— মা অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের!

বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কিদোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন— বাকিগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাইগাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুঁচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-একবার এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন— কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কী ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকালবেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন— সেসব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো কেষ্ট মুখুয্যে... 'স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না' করে কী কাণ্ডটাই করলে— অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে, মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তার কী স্বভাব? রাম বলো, ছ-সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়!— পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশিদূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের...

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন— এই শ্রাবণে তেরোয়...

— আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাত কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোর তফাতটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসাব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কী জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা, বিয়ে হওয়াও তা; সাতপাকের যা বাকি, এই তো?... সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব, এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফ্যালো।... পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?... গরিব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই-বা জানলে? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর— শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্— রাজার হাল! দুই ভাইয়ের অভাব কী?...

ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথাব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকি— শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোনো ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্টপক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েকমাস পূর্বে নিজের গ্রামে কী একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এরকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুইপরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপনমনে তামাক টানিতেছেন। বড়মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল— বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল...

সহায়হরি একবার বাড়ির পাশে ঘাটের পথের দিকে কী জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন— যা শিগগির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি!— কথা শেষ করিয়া তিনি

উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কী জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড একটা লোহার শাবল দুইহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল— তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল— ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন, মুখুয্যেবাড়ির ছোট খুকি দুর্গা আসিয়া বলিল— খুড়িমা, মা বলে দিলে, খুড়িমাকে গিয়ে বল্ মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যেবাড়ি ও-পাড়ায়— যাইবার পথের বাঁ-ধারে একজায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে একপ্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হলদে পাখি আমড়াগাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল— খুড়িমা, খুড়িমা ওই যে কেমন পাখিটা!— পাখি দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল ... কে যেন কী খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা খানিকদূর যাইতে-না-যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্‌শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন— এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল— এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোলো সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন— ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে— কর্তাঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং ...

অন্নপূর্ণা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন— বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কী করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন— আমি! না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি ... সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতোই স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন— চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।... আমি সব

জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কী... দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কীসব খুপ্ খুপ্ শব্দ... তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ... তোমার তো ইহকালও নেই, পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোনো পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ি ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন— ক্ষেন্তি এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল— সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— এই মেটে আলুটা দুজনে মিলে তুলে এনেছিস না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ির সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন— কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কিনা?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, উত্তর দিল— হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন— পাজি, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছ মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে! যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না-জোটে না-খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কী করব, মা?

দু-তিনদিন পরে একদিন বৈকালে ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল— মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুঁচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোটবোনটিকে লইয়া সেখানে মহাউৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থিবন্ধনে বন্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামির মতন ঊর্ধ্বমুখে একখণ্ড শুষ্ক

কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড়মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে!

ক্ষেন্তি বলিল— কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন— দ্যাখ্, হয়তো বেঁচে যেতেও পারে! আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোটমেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যেবাড়ি হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন— হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কী হয়? দেখ দিকি, এই শীত।

— আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো...

— হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে— অসুখ-বিসুখ পাঁচরকম হতে পারে বুঝলিনে? — সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেকদিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে!

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ।

বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না— ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষসংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন— একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনির নিচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া এক মালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে-সেখানে বসে, বনেবাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোটমেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল— মা, ওই একটু...

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজোমেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মা'র সামনে পাতিয়া বলিল— মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন— দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ওই নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।... ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজোমেয়ে পুঁটি বলিল— জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরি করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল— এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমতন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েশ, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল- হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপ্‌টা হয় না? খেঁদি বলছিল, ক্ষীরের পূর না-হলে কি আর পাটিসাপ্‌টা হয়? আমি বললাম, কেন আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল— খেঁদির ওইসব কথা! খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ি দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়িমা দুখানা পাটিসাপ্‌টা খেতে দিলে। ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ! আর মা'র পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল— মা, নারকোল-কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন— নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কী হবে, যা ওইদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারিকেলের মালায় একথাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন— ওরে, তোরা সব এক-এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল— মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোটমেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন— ক্ষেন্তি আর নিবি?... ক্ষেন্তি খাইতে

খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখচোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল— বেশ খেতে হয়েছে, মা। ওই যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু ... সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর একটু শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন— ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজকর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ-শব্দটি মুখে নেই, উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ি, সিলেট চুন ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু-পয়সা নাকি করিয়াছে— এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কি না।

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয়, এইজন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন— চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ির বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রঙের মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলির আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।... তাঁহার এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল— মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও... দুটো মাস তো...

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন— তোর বাবা তোর বাড়ি যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক— তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল— না, যাবে না বৈকি?... দেখো তো, কেমন না যান্!

ফাগুন-চৈত্রমাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমস তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত... তাঁহার অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়িতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে— মা, বল্‌ব একটা কথা, ওই কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন— ও তুমি ধরে রাখো, ওরকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভালো কী আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চট্‌কাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, — নাহ্, সব তো আর... তাছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব।... তোমার মেয়েটির হয়েছিল কী?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছটি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন— বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কী দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

— একেবারে চামার...

— তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা! মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে...ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মতো খাই-খাই...আরও কত কী! পৌষমাসে দেখতে গেলাম— মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দুজনের কোনো কথা শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন— তারপর?

— আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষমাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু-হাতে!...পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন— বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে— আজই না-হয় আমি ...প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কসুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

— তারপর ফাগুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার— বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূরসম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল— তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

— দেখতে পাওনি?

— নাহ্! এমনি চামার— গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ...যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, বেলা গেল। ...চার কি ঠিক করলে... পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না...

তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাক্‌লি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারি করিতেছেন। পুঁটি ও রাধা উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধা বলিতেছে— আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন।

পুঁটি বলিল— আচ্ছা মা ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

— ওমা দেখ মা, রাধার দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে...

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন— সরে এসে বসো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এইদিকে আয়।

গোলা তৈয়ারি হইয়া গেল... খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠা টোপরের মতোন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল— মা দাও, প্রথম পিঠাখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন— একা যাসনে, রাধাকে নিয়ে যা।

খুব জোছনা উঠিয়াছিল, বাড়ির পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার থোলো থোলো শাদাফুলের মধ্যে জোছনা আটকিয়া রহিয়াছে।...

পুঁটি ও রাধা খিড়কিদোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্‌খস্‌ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কিদরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পুঁটি ও রাধা ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন— দিলি?

পুঁটি বলিল— হ্যাঁ মা, তুমি আর-বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে... রাতও তখন খুব বেশি।... জোছনার আলোয় বাড়ির পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠ্‌ঠোকরা পাখি ঠক্‌-র্‌-র্‌-র্‌ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল— দিদি বড় ভালোবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনাআপনি উঠানের এককোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল... যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া, কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!...

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের— মঙ্গলই হবে বোধহয়— যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজেকর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দুদিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়— আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোনো-এক আশ্চর্য সরোবরে— পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জলজীবনের প্রথম বড়শিতে হৃদয় বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্যকিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে-মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টাদুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার উপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তারই উপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনোদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ করে চলে গেছে। একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মতো রেখাও কিছুদূরে গিয়ে দুধারে বাঁশঝাড় আর বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দুজন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে— কে জানে আর কোন্ অভিসন্ধিতে!

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন, মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিকবাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কিনা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গরুগুলো— মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গরুর গাড়ির এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্যব্যয় না করে সেই গরুর গাড়ির ছই-এর ভেতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিনজোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কীভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গরুর গাড়িটি তারপর যে পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাঁধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ একসময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে — 'এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।'

ব্যাপারটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র বিতাড়ন সম্ভব কিনা— কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হলে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কী করে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধহয় উঠে এসেছে। তারই

স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দুপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ— কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সবকিছু নিমগ্ন হয়ে আছে— জাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে-একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানাপচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গপ্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেইসঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহুযুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসেবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করেছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলেস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পান-রসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝেরে উপর কোনোরকমে শতরঞ্জির আবরণ পড়তে-না-পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকাধ্বনি করতে শুরু করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতারসংকেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিতসম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন— ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস।

আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতিমুহূর্তে কোথাও ইঁট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি উপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চমবাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যুসুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রুপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে ছায়া সরে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্‌বুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন একসময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না!

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। একসময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলাঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্যসমেত বড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকেপড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে। দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনাটার উপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি

ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন কেন? টান দিন।'

সে– কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে উঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সে–ও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধহয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

একসময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্যশিকার–নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়তো আপনার পান–রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন — 'কে আবার বলবে! এইমাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!'

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান–রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেইসঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে!

যে ভগ্নস্তূপে গতরাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করেছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ করেছেন, শুধু

কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সবকিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন ! একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। উপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছে মনে হবে— সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, 'একটু শুনে যাও মণিদা।'

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কী যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কী বলব।'

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ওহ্, সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, কেবলই বলছেন— "সে নিশ্চয়ই এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!" কী যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোনো কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে!'

'হুঁ, এ তো বড় মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।'

উপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতরকণ্ঠে অনুনয় করবে, 'তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারো।'

'আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।'— মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, 'এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যাহোক। বুড়ির হাত-পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।'

ব্যাপারটা কী এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ব্যাপার আর কী! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূরসম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর-চারেক আগেও সে ছোকরা ওঁকে বলে গেছল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুণছে।'

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, 'নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?'

'আরে সে বিদেশে গেছল কবে, যে ফিরবে। নেহাত বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে-থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবে না, আর বিশ্বাস যদি করেন তাহলে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছেমিছি পাতকের ভাগী হবে?'

'যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?'

'তা আর জানে না! কিন্তু মা-র কাছে বলবার উপায় তো নেই! যাই, কর্মভোগ সেরে আসি!'— বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো বলে ফেলবেন, 'চলো, আমিও যাব।'

'তুমি যাবে!' মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

'হ্যাঁ, কোনো আপত্তি আছে গেলে?'

'না, আপত্তি কিসের!'— বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরটিতে আপনি পৌঁছবেন, মনে হবে, উপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটিমাত্র জানলা, তা-ও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তপোশে ছিন্ন কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে : 'কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল! বাবা তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন করে পালাবি না?'

মণি কী যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, 'না মাসিমা, আর পালাব না।'

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশিরবিন্দুর মতো ঝরে পড়েছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, 'আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুণেছি।'

বৃদ্ধা এতগুলো কথা বলে হাঁপাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কী ধীরে ধীরে

গলে যাচ্ছে— ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই— তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ— দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কী-না করছে!'

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, 'যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

তারপর বিকালে আবার গরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে! আপনারা তিনজনে একে-একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ খুলে যামিনী শুধু বলবে— 'আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!'

আপনি হেসে বলবেন, 'থাক্ না। এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে!'

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশো না দেড়শো বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল— আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। সেসব কথা ভালো করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদ্‌স্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন— 'ফিরে আসব, ফিরে আসব।'

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটখাটো বাধা বিড়ম্বিত ক'টি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প-দেওয়া শীতে, লেপ-তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে একশত পাঁচ

ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, 'ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?' আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়ামোছা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

রস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুরবাগান ঝুড়তে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনেরো যেতে-না-যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজু খাতুনকে। পাড়াপড়শি সবাই অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছরখানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজু খাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজু খাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাটিখালির সেখেদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজু খাতুনের আছেই বা কী? বাক্স-সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত-খামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজু খাতুন! ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠাখানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কী একখানা ডানা কাটা হুরির মতো চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁটসাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কী আছে মাজু খাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার বাড়ির, কাজীবাড়ির বউ-ঝিরা হাসাহাসি করল : 'তুক করছে মাগী, ধুলাপড়া দিছে চোখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেবে না? অমন মানুষের চোখে ধুলাপড়া দেওয়নেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চোখে। দেখছ তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধুলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের। বেছে-বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খাপসুরৎ চেহারার একটি বড়বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি- সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠারো-উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে-পরতে কষ্ট দেয়, মারধোর করে— এইসব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ

থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেইজন্যই ইচ্ছা করে নিজে ঝগড়া-কোন্দল বাধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। একনজরেই বুঝেছিল যে, সে-ও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গি পরলে ফরসা ছিপছিপে চেহারা চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউখেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম শেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গতবার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখেশুনে যার-তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদ-আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুনাগার দু-এক কুড়ি নয়, পাঁচ কুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজি হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে!

মুখ ভার করে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্‌শেওড়া আর চোখ উদানের আগাছার জঙ্গলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসি কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসল ফুলবানু, 'কী মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?'

'চলব না? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বাজানের!'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হয়ছে কী? পছন্দসই জিনিস নেবা, বাজানের গুনা, তার দাম দেবা না?

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বাজানের নয়, বাজানের মাইয়ার। হাটে-বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা সোনা-জহরত ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝবো ক্ষেমতা, বোঝবো কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হনহন করে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মেঞা, রাগ করলানি? শোনো শোনো।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কী শোনবো'?

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কী, শোনবা মনের কথা। শোনো, বাজানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনাদানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম-কুকাম কইরো না মেঞা, জমি-ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মতো জমি-ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বে-সবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখুয্যেবাড়ি, মুন্সীবাড়ি— কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্‌কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার-পাঁচ কুড়ি খেজুরগাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গতবছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনত কম নয়, এক-একটি করে এতগুলো গাছের শুকনো মরা ডালগুলো বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে-তুলে জুতসই করে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপটুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে! অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুরগাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এ তো আর মা'র দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুরগাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল; এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে আবার হাত বুলাতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোনো ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক-ওদিক হলে বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে গাছের দফা-রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে, কিন্তু সে-গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরবে না রাতভরে।

খেজুরগাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজহাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এসব তত্ত্বকথা আর বিধি নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মতো অমন নামডাকঅলা গাছি ধারে-কাছে ছিল না। যে-গাছের প্রায় বারোআনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়ত আধহাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলাহাঁড়িতে উঠত। তার হাতে খেজুরগাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোনো ক্ষতি হত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছরকয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু-চারজন আরো ছিল রাজেকের— সিকদারদের মকবুল,

কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মতো হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মতো।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মতো মানুষ চাই। পুরুষমানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে— কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনত। কিন্তু বছরদুই ধরে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু-বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজু খাতুনের ঝাঁপআঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছ নাকি মাজুবিবি?'

ঘরের ভিতর থেকে মাজু খাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজু খাতুন উঠে ঝাঁপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কী কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজু খাতুরে। রস জ্বাল দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কী বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজু খাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোলোআনা দিতে চাই, রাজি হবা তো নিতে?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজু খাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গতামাশা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাইবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটানো যায়?'

ইশারা-ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট করে খুলে বলল মনের কথা। কোনোরকম অন্যায় সুবিধা-সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা করে নিয়ে যেতে চায় মাজু খাতুনকে। ঘর-গেরস্থালির ষোলোআনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজু খাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গতামাশার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়াপোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে!'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কমবয়সী মাইয়া-পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজু খাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি। আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মতো মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলো মাজু খাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলো মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হাল্‌কা ঠাট্টা-তামাশা চলত, কিন্তু তার বেশি এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজু খাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাটখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজু খাতুনের উঠানে আর মাজু খাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়। হাতের গুণ ছিল মাজু খাতুনের। তার তৈরি গুড়ের সের দু-পয়সা বেশি দরে বিক্রি হত বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশিরভাগ খেজুরগাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু-এক হাঁড়ি রস কোনোবার ভদ্রতা করে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মতো হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাসখানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দুআনা করে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের— মাজু খাতুন গুড় চুরি করে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রি করাচ্ছে সেই গুড়, ষোলোআনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজু খাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধবুড়োদের দলের আরো করেছে দু-একজন, কিন্তু মাজু খাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজু খাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ানো যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলো ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খাপসুরৎ মুখও কারো নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরও আসতে হল দু-এক সন্ধ্যা, তারপর নীলরঙের জোনাকি শাড়ি প'রে, রঙবেরঙের কাচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজু খাতুন।

ঘরদোরের কোনো শ্রীছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর অগোছালো হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজু খাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপে-পুছে ঝকঝকে তক্‌তকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরণীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছে-গাছে। পাড়ায় আরো অনেকের— বোসেদের, বাড়ুজ্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ করে দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা উঠানের পশ্চিমদিকে মাজুবানুকে তুলে দিয়েছে মোতালেফ। সারে সারে উনান কেটে তার উপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুবানু। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয় ! মাজুবানু এর-ওর বাগান থেকে, জঙ্গল থেকে, শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পরে মনের মতো কাজ পেয়েছে মাজুবানু, মনের মতো মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে। বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্তবেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলোর মধ্যে জমে থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটেগুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তা-ও বিক্রি হয় পাঁচআনা-ছআনা সের ! দুবেলা দুবার করে এতগুলো গাছে উঠতে-নামতে ঘনঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করে। পায়ের নিচে দূর্বার মধ্যে চিকচিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শিরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ। কিন্তু এতবেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মতো পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায়নি কোনোদিন। ব্যাপারটা কী ? গাছ-কাটা অবশ্য মনের মতো কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে ?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু-হাঁড়ি রস আর সের-তিনেক পাটালিগুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশটাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের ?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার— '

তাজা কড়কড়ে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায়নি কোথাও, কোনো জায়গায় ছাপ লাগেনি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কী করব মেঞা ? তুমি তো শোনলাম নিকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত ?'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে মাজু খাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ করে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মেঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে–শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকি ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলাল ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কী!'

মানের দায়ে, জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি–চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কী করে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি করে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কী করে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা। কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে?'

মনে এলেও মুখ ফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চলে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায় জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তাহলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কী ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতরগুনা ঘইসা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?'

মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না তো কি মিছা? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইন্‌ষের নতুন গন্ধে ভুরভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুরভুর করবে কেবল, সবুর করে থাকো আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু–মাসের বেশি সবুর করতে হল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকা জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজু খাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শিকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব–চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার–ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজু খাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতি মেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরি তোমার মনে! গুড়ের সময় পিঁপড়ার মতো লাইগা ছিলা, আর গুড় যেই ফুরাইল অমনি দূর দূর।'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাবগাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতো মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে। পাড়াপড়শি বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খেলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে–না–হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন–বাড়ন, ঘর–গেরস্থালি। কাছে বসো আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর ! এ কয়মাস কাটাইলা কী কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুরগাছ লইয়া !'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সে গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু 'গাছি'র কাছেও যে গাছের রস দুই–চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বারোমাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজু খাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতোই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদি–বা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়াপড়শিরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু–বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাহ, বউ–বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজু খাতুনের। মনে হয় সে–ও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে। দিনকয়েক পরে রাজেকের বড়ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলো। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ি–টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন–আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজু খাতুনের মতো একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউ তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজু খাতুন জিগ্যেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, একপঞ্চাশ।'

মাজু খাতুন খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল— হ্যাঁ, ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজু খাতুন জিগ্যেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুরগাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান ! ওসব কাম কোনোকালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ–কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারি ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজু খাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুরগাছের ধারেকাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজু খাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজু খাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহলে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজু খাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কী।'

দেরি বেশি হলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক-মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজু খাতুন— পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মতো ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন-রাইত, তার হাত থিকা তো বাঁচলাম, কী কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না; পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ভয় নাই? পাখা মেইলা কখন উড়াল দেয় তার ঠিক কী!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উড়াল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই ঘর পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইনষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এইরকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চোখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু— হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার করে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা, যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি-হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মশলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমি তো বেশি ভক্ত না পানের। দিনরাতই খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন-রাইত খাওয়া ধরো। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষমাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর একজনের পান খাওয়া ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁই-ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুয্যেদের কিছু কিছু জমি বরগা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মতো নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, কাটে, জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রং রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বরগা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর

মুখুয্যেদের বিঘে-চারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ।

পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা হইয়া গেলা আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়, সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলো পাওয়া যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজি নয় তাতে। এত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউশ ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ— এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পারো না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সেসব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় করে পৈকায় করে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় করে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার লাগান কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন-কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন, মোতালেফের বছরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুরগাছের সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ে। এ কাজে নাম-ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাড়ুজ্যেদের কুড়ি-দেড়েক গাছ বেড়ে গেল!

গাছ কাটবার ধূম লেগে গেছে। একটু বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার-দেনা শোধ দিতে হবে, সারাবছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মতো দিনভর খাটে মোতালেফ আর বিছানায় গা দিতে-না-দিতেই ঘুমে ভেঙে আসে চোখ। দুহাতে ঠেলে, দুহাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোনো অঙ্গ সাড়া দেয়

না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও— যেমন মিঠা হাত তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু-এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস একসঙ্গে সে কোনোদিন দেখেনি, কোনোকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কী, আমি তো আছিই কাছে কাছে— আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন করে টগবগ করে না জালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখমুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর; রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমতো। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনোদিন-বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইয়া কইয়া দেই, বুঝাইলে বুঝো না। এই গুড় হইছে! এইনি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না ক্যান্। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইসো বাজারে। তুমি আইসো বেইচা। খাপসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু-চারদিনের মধ্যেই কোনোরকম চলনসই গুড় তৈরি করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মতো, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।

পুরনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের— 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মেঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেলবছরের মতো সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জেহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মতো এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বারকয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা, ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে 'হ হ, চিনছি। আর বকবক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইন্‌ষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজু খাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজু খাতুন এমন করে মুখঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় করে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটির চালার দোরের কাছে, 'কী রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোনো জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কীরকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে সারে গোটা-পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কী করে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চিৎকার বেরুল— 'কই, কোথায় গেলি হারামজাদি?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দুদিন ধরে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড়চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা-সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের উপর। একমুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি করে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ— 'হারামজাদি, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর-গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী। এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয়, আমার অপবাদ হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটকঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসাল, বকল, ধমকাল, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বাজান তোমার সাথে— এমন গোঁয়ার মাইন্‌ষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরের অমন বারবার অদলবদল আর ঘর বদলানো কি চলে! তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দুদণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও! খানিকবাদেই আবার যেচে আপস করল মোতালেফ। সেধে-ভজে মান ভাঙাল ফুলবানুর! পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু! দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোনো রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কী!'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে! সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা, তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। সে কথা ওরা বলেও জানে, শুনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বছর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ করে বসে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুরগাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গতবছরের মতো যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মতো খটখট করে মন, দুপুরের রোদের মতো খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটাফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম্!'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপান ভালো তো —?'

মাজু খাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারলে না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোনো রকমসকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত করে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই-তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনোকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারি! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কী? দুইসের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানের খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে!'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কী মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ন আইজ। খাইয়া দ্যাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলো কত মিথ্যা; পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজি হয় নাদির, আর বাকি দু-সের পয়সা গুণে দেয় জোর করে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজু খাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, আমি ও গুড় ছোঁব না হাত দিয়া। তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজু খাতুন নিষেধ করে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইনষের সাথে যদি ফের খাতির-নাতির করো, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজু খাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেস, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিনকয়েক পর একদিন ভোরবেলায় দুটি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু-হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়ানৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্‌টানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে— 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'কেডা? ও আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজু খাতুনের জন্যে। যে মানুষের নামগন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না-জানি কী কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজু খাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম-ভরম নাই মনের মইধ্যে? কোন্ মুখে ওঠল আইসা এখানে?'

নাদির ফিসফিস করে বলে, 'আস্তে, আস্তে,— একটু গলা নামাইয়া কথা কও, বিবি। শোনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজু খাতুন বলল, 'তুমি বোঝো না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ করো, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে— একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি লাজশরম নাই?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজু খাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য! এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দামন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে, মাজু খাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহতা বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়িদুটি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাহেব, শোনবেননি একটু!'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন তামাক খান!'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই কন না, দোষ কী তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। কন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজু খাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুইসের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মেঞা! নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর একছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে-বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হয়েছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কী বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছলছল করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁশ হল নাদির শেখের ডাকে, 'ও কী মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না, আগুন যে নিবা গেল কইলকার।'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

বন-জোছনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জঙ্গলের মধ্যে জোছনা পড়েছে ।

দুপাশে নিবিড় শালের বন। কিন্তু নিবিড় হলেও পত্রাচ্ছাদন লতাগুল্মে জটিল নয়— পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। আলো-আঁধারির মায়ায় অপরূপ হয়ে আছে অরণ্য।

সরুপায়ে চলার পথ দিয়ে শিউকুমারী এগিয়ে চলছিল। কাঁখের কলসি দেহের ললিত ছন্দে দোল খাচ্ছে— শুকনো শালের পাতা পায়ের নিচে যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠছে। এই সন্ধ্যায় একা জঙ্গলের পথ নিরাপদ নয়। বাঘ আছে, ভালুক আছে, হাতি আছে, নীলগাই আছে, বরা আছে— কী নেই এই বিশাল অরণ্যে? তবু শিউকুমারীর ভয় করে না। তাছাড়া ডুয়ার্সের বাঘ নিতান্তই বৈষ্ণব, পারতপক্ষে তারা মানুষের গায়ে থাবা তোলে না, এমনি একটা জনশ্রুতিতেও এদেশের লোক প্রগাঢ়ভাবে আস্থাবান।

বনের মধ্যদিয়ে একা চলেছে শিউকুমারী। গায়ের রুপোর গয়নায় জোছনার ঝিলিক। জঙ্গলের বুকে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো বিসর্পিত রেখায় ঝোরার জল যেখানে বয়ে গেছে, সেখানকার ঘনবিন্যস্ত ঝোপের ভেতর উঠেছে বুনোফুলের গন্ধ। জোছনায় মাতাল হয়ে ডেকে চলেছে হরিয়াল— পূর্ণিমারাত্রির মায়ায় তারও চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেছে। শুধু থেকে-থেকে কোথায় তীব্রস্বরে চিৎকার করছে একটা ময়ূর— পাখা ঝটপট করছে, হয়তো বেকায়দায় পেয়ে কোথাও আক্রমণ করেছে শিশু একটা পাইথনকে। অকৃপণ পূর্ণিমা আর অনাবরণ সৌন্দর্যের মধ্যেও আরণ্যক আদিম হিংসা নিজেকে ভুলতে পারেনি— হরিয়ালের সুরে আর ময়ূরের ডাকে রুদ্র-মধুরের ঐকতান বেজে চলেছে।

জঙ্গল শেষ হতেই খরখরে বালি। পলিমাটির নরম কোমলতা নয়, মুক্তাচূর্ণের মতো মিহি মখমল-মসৃণ বালিও নয়। চূর্ণ পাথরের টুকরো এখানে কাঁকরের মতো ধারালো। ভরা বর্ষায় জলঢাকা যে-সমস্ত পাথরের চাঙড় হিমালয়ের বুক থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল, অতিকায় কতগুলো কচ্ছপের মতো সেগুলো বিশাল বালি-বিস্তারের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ওপারে ভুটানের কালো পাহাড়। আর তলা দিয়ে ছেদহীন অরণ্য— ডুয়ার্স থেকে টেরাই। দুর্গমতার ওপারে প্রতিরোধের তর্জনী। দেবতাত্মা নগাধিরাজের অলঙ্ঘ্য প্রাকার। আলোয় ধোয়া আকাশের নিচে পৃথিবীর বুক ঠেলে ওঠা কালো বিদ্রোহ। আর সামনে পাহাড়ি নদী জলঢাকা।

কতটুকু নদী, কতটুকুই বা জল। বুক পর্যন্তও ডুববে কিনা সন্দেহ। দেখে মনে হয় পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু মনে হওয়া পর্যন্তই— শুধু হেঁটে কেন, নৌকোতেও পার হওয়া চলে না। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে দুর্দান্ত স্রোতে জল নেমে চলেছে, পাহাড় থেকে সমতলে, সমতল থেকে সমুদ্রে। স্বপ্ন থেকে হঠাৎজাগা নির্ঝরের বজ্রগর্জন। জলের তলায় তলায় ঠেলে নিয়ে চলেছে বেলেপাথর আর গ্র্যানাইটের জগদ্দল স্তূপ। নিচে পাথরে পাথরে সংঘর্ষ— ওপারে খরখরে বালি ভেঙে জলের হুঙ্কার। এতটুকু নদীর কলরোল এক মাইল দূর থেকেও কানে আসে।

জোছনায় ঝলসে যাচ্ছে জলঢাকা। শান্ত ঘুমন্ত আলোর বাঁকা তলোয়ার নয়। পাহাড়িরা যাকে সোনালি অজগর বলে এ যেন ঠিক তাই। ক্ষুধার্ত সোনালি অজগরের মতো গর্জন করে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে— যেন মুখ থেকে ছিটকে পালিয়ে যাওয়া শিকারের সন্ধানে তার অভিযান।

কাঁখে কলসি নিয়ে শিউকুমারী স্থির হয়ে দাঁড়াল খানিকক্ষণ। পেছনে অরণ্য, ওপারে অরণ্য আর পাহাড়, মাঝখানে নদী। আকাশে চাঁদ।

বাড়ি খুশি লাগছে মনটা। আনন্দে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। এমনি জোছনারাতেই তো 'পিতমে'র আসবার কথা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে উৎরাইয়ের পথ। দুধারে শালের বন হাওয়ায় কাঁপছে। পাহাড়ি ঝাউয়ের একটানা শোঁ-শোঁ শব্দ। জংলি কলার পাতাগুলো কাঁপছে, কাঁপছে জোছনার রঙ মেখে। আর সেই পথ বেয়ে নামছে ঘোড়া, নেমে আসছে ঘোড়সওয়ার। খট্ খট্-খটাখট্! বুকের রক্তে মাতলামির দোলা লেগেছে, সমস্ত শিরাস্নায়ু চকিতে হয়ে উঠেছে অধীর এবং উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়। 'পিতম' আসছে অভিসারে।

একটা গানের কলি গুনগুন করে দুপা এগিয়ে আসতে-না-আসতেই আবার শিউকুমারীকে থেমে পড়তে হল। আকাশের চাঁদে আর মায়াময় পৃথিবীতে মিলে বন-জোছনার যে অপূর্ব সুর বাজছিল— হঠাৎ সে সুর কেটে গেছে। ভয়ে আর আশঙ্কায় সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠল।

জলের ধারে সাদামতো পড়ে আছে, ওটা কী? পাথর? না— পাথর নয়। বিকেলেও শিউকুমারী ওখানে গা ধুয়ে গেছে, তখন তো ওটা ছিল না। আর এতটুকু সময়ের মধ্যে এত বড় একখানা পাথর তো আর হাওয়ার মুখে উড়ে আসেনি। তাহলে?

নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু মানুষ এল কী করে? কেউ খুন করেছে নাকি? জানোয়ারে মেরে দিয়েছে? দুটোই সম্ভব। নন্‌রেগুলেটেড্ এরিয়া— আইনের বন্ধন এখানে শিথিল। অরণ্য-রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে আরণ্যক মানুষেরাই, সেজন্যে তাদের সদরে আদালতে ছুটে যেতে হয় না। আর সন্ধেবেলায় দু-চারটে জানোয়ারের জলের কাছে আনাগোনাও খুবই সম্ভব। বিশেষ করে ভালুকের আমদানিটা তল্লাটে এমনিতেই একটু বেশি।

কয়েক মুহূর্ত শিউকুমারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে? এগিয়ে যাবে ওখানে? কে জানে কোনো অনিশ্চিত বিপদ ওখানে অপেক্ষা করে আছে কিনা। এই জঙ্গল আর জনহীন নদীর ধারে। এখানে বিপদআপদ এলে সে কী করতে পারে!

কিন্তু ইতস্তত করে লাভ নেই। দেখাই যাক না। ভুটানি মেয়ের নির্ভীক নিঃসংশয় মন আত্মস্থ হয়ে উঠল ক্রমশ। ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

মানুষই বটে। কিন্তু বিদেশি— বাঙালি। জলের ধারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে । ভালুকে খায়নি, তাহলে চোখ-নাক নিশ্চয় আস্ত থাকত না। গায়ে কোথাও রক্তের দাগ নেই — ক্ষতচিহ্ন নেই কোনোখানে। কাপড়টা গোছানোই আছে, সাদা জামাটার সোনার বোতামগুলো আলোতে ঝিকিয়ে উঠছে। আর, আর— কী আশ্চর্য, মানুষটা মরেনি। সমস্ত শরীরে ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে বড় বড় নিশ্বাস উঠছে তার, নিশ্বাস পড়ছে। কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

তারপর আর ভাবতে হল না শিউকুমারীকে। কলসি ভরে সে জলঢাকার জোছনাগলা তুহিন শীতের জল নিয়ে এল, সস্নেহে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে একটুখানি উড়ানির হাওয়া দিতেই অজ্ঞান মানুষের দীর্ঘায়ত ক্লান্ত নিশ্বাস ক্রমশ সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। আরো খানিক পরে চোখ মেলল মহীতোষ। বিহ্বল অর্থহীন দৃষ্টি। সমস্ত চিন্তা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে অস্পষ্ট নীহারিকার মতো দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। খণ্ড খণ্ড, ছিন্ন ছিন্ন। রূপ নেই, আকার নেই, অর্থসঙ্গতি নেই!

আরো জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগল শিউকুমারী। আরো বেশি করে ছিটিয়ে দিলে জল। জলঢাকার বরফগলা স্পর্শে মরা মানুষ চমকে উঠতে পারে, আর মহীতোষ তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে মহীতোষ উঠে বসল।

সামনে তরুণী নারী। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কালো চোখে জোছনা, সুন্দর মুখখানিতে জোছনা, কর্ণাভরণে জোছনা। পাশ দিয়ে তীব্র কলরোলে বয়ে যাচ্ছে জলঢাকা। পুলিশ নয়, পেছনে ছুটে আসা শত্রুও নয়। গতিশীল, ভয়ত্রস্ত জীবনের সমস্ত চঞ্চলতা যেন এখানে এসে স্থির আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে কি পরী এসে নেমেছে তার পাশে? অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে কি শেষপর্যন্ত মরে গেছে মহীতোষ, আর মৃত্যুর পর পৌঁছে গেছে একটা আশ্চর্য জগতে?

মর্মরশুভ্রা বিদেশিনী তরুণী। মূর্তির মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে— বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা একসঙ্গেই সে দৃষ্টির মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। কিন্তু মর্মরমূর্তি নয়, মানুষই বটে।

মহীতোষ বললে, আমি কোথায়?

হিন্দি মেশানো বাঙলায় জবাব দিলে মেয়েটি : নদীর ধারে।

নদীর ধারে! মহীতোষের মনে পড়ে গেল। পালিয়ে আসছিল— সে আর অরবিন্দ। শালবনের মধ্যে অরবিন্দ কোথায় হারিয়ে গেল— তার আর সন্ধান মিলল না। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, প্রতীক্ষা করবার উপায় নেই। পালাও, পালাও, আরো জোরে পালিয়ে চলো। আগের দিন কিছু খাওয়া হয়নি, সারারাতের মধ্যে চোখ বুজবার উপায় ছিল না একটিবারও। খিদে-তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা অসাড় আর শিথিল হয়ে গেছে। তারপর ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ল জল। পিপাসার্ত পশুর মতো সেদিকে ছুটে এল মহীতোষ। তারও পরে? আর কিছু মনে পড়ে না।

মেয়েটি আবার বললে, কী করে এলে এখানে?

জবাব দিলে না মহীতোষ। কী জবাব দেবে, কেমন করে জবাব দেবে! অবসাদে ভারী, আচ্ছন্ন চোখদুটো উদাসভাবে মেলে দিয়ে সে তাকিয়ে রইল ওপারের ঘনান্ধকার অরণ্য কালো পাহাড়ের অতিকায় দিগ্‌বিস্তারের দিকে।

শিউকুমারী বললে, উঠতে পারবে? তাহলে চলো আমাদের ঘরে।

মহীতোষ তবুও ভাবছে। কোথায় যাবে সে? কোন্‌খানে তাকে নিয়ে যাবে এই অপরিচিতা রহস্যময়ী মেয়েটি? কোন্ অজ্ঞাত পৃথিবীর আমন্ত্রণ তার দৃষ্টিতে?

মহীতোষ শেষপর্যন্ত উঠেই দাঁড়াল। ক্লান্তিতে সর্বশরীর কাঁপছে, মাথাটা ঘুরে পড়তে চাইছে মাটিতে। এক কাঁখে কলসি ধরে, আর একখানা হাত অসংকোচে শিউকুমারী এগিয়ে দিলে মহীতোষের দিকে : নাও, আমার হাত ধরে চলো।

অন্য সময় হলে দ্বিধা করত মহীতোষ। সহজাত শিক্ষা আর সংস্কারে একটি অজানা-অচেনা তরুণী মেয়ের শুভ্র হাতখানিকে আশ্রয় করবার কল্পনাতেও রক্তে দোলা লেগে যেত। কিন্তু চেতনা তখনো সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি। যেন অর্ধতন্দ্রায়, অথবা পরিপূর্ণ স্বপ্নের মধ্যেই সে খেয়াল দেখছে। চাঁদের আলোয়, বালিতে, জল কল্লোলে আর বনের মর্মরে সমস্ত পৃথিবীটাই তো অবাস্তব হয়ে গেছে। মন এখানে প্রশ্ন করে না, দ্বিধা করে না। এমন একটা আশ্চর্য পটভূমিতে সবই সম্ভব, সবই স্বাভাবিক।

শিউকুমারীর ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা আঁকড়ে ধরল মহীতোষ। সুগঠিত সুঠাম দেহের উপর সমস্ত শরীরের ভারটাই এলিয়ে দিয়ে বালির উপরে পা টেনে এগিয়ে চলল সে। একটা সুগন্ধ নাসারন্ধ্র বয়ে যেন তার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু সে গন্ধ মেয়েটির দেহ থেকে, অরণ্য থেকে, না আকাশের চাঁদ থেকে— মহীতোষ ঠিক বুঝতে পারল না।

বালির রেখা ছাড়িয়ে জঙ্গল। শালবনের ভেতর দিয়ে মানুষ, হরিণ আর ভালুকের চলার পথ। ঝরা শালপাতায় পদধ্বনির মর্মরিত প্রতিধ্বনি। ময়ূর ডাকছে না, কিন্তু হরিয়ালের মাদক সুর ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। হিংস্র জানোয়ারের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে না কোথাও। চকিতের জন্য কানে এল হরিণের মিষ্টি আহ্বান। এমন অপূর্ব বন-জোছনায় সে হয়তো হরিণীকেই সন্ধান করে ফিরছে। কঁক-কঁক-কোঁ! ঝোপের মধ্য থেকে অস্পষ্ট গদ্‌গদ ধ্বনি। বনমোরগ দম্পতি হয়তো মিলনমায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে কোথাও।

বন-জোছনা। শিউকুমারীর মনে পড়ে এমনি রাত্রে আসবে পিতম। জংলি কলার পাতায় পাতায় ছায়া কাঁপছে পাহাড়ি পথে। ঝাউয়ের বনে উদাস বিরহাতুর দীর্ঘশ্বাস। আর পাথরবাঁধা পথ দিয়ে সাদা ঘোড়ার খট্‌খট্ সোয়ারি হয়ে আসছে দূরবাসী প্রিয়তম— শালের কুঞ্জে বাসরযাপন।

শিউকুমারী কি গুনগুন করে গান গাইছে? মহীতোষ কিছু বুঝতে পারছে না। চেতনা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। এই জোছনায়, বনের এই সংগীতে, এই রহস্যমধুর পথচলার ছন্দে। শিউকুমারীর গায়ের উপর ভারটা ক্রমশ বেশি হয়ে চেপে পড়েছে। মহীতোষ আবার কি ঘুমিয়ে পড়ল, না অজ্ঞান হয়ে গেল একেবারে?

জঙ্গলের এদিকটা অনেকখানি ফাঁকা। ডি-ফরেস্টেশনের প্রভাবে জঙ্গল হাল্‌কা হয়ে গেছে— ওদিকে তো একেবারেই নেই। মানুষের কুঠারের ঘা পড়েছে অরণ্যের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যে। কাঠ চাই। ইন্ধনের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, সভ্যতার সংখ্যাতীত প্রয়োজনের জন্য, এমনকি জঙ্গল সংহার করবার কুঠারের বাঁটের জন্য। ক্ষতবিক্ষত অরণ্য দিনের-পর-দিন হ্রস্ব হয়ে আসছে, অন্তিম প্রতিবাদে ছোটবড় গাছ আর একরাশ লতাগুল্ম দলিত করে লুটিয়ে

পড়ছে বৃদ্ধ বনস্পতি, মানুষের অবিশ্রান্ত দাবির মুখে পৃথিবীর প্রথম অধিবাসীরা নিঃশব্দে আত্মদান করে চলেছে। শুধু ব্যথাতুর বুকের মধ্যে সঞ্চিত জ্বালা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে দাবানল হয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। শুকনো পাতায় ধু-ধু শিখা জ্বালিয়ে আর লতাগুল্মকে পুড়িয়ে দিয়ে শাঁ-শাঁ করে এদিকে-ওদিকে সরীসৃপ গতিতে আগুনের প্রবাহ চলে জলস্রোতের মতো। এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়— সোজা চলতে চলতে হঠাৎ ডাইনে-বাঁয়ে মোড় ঘোরে। বনানীর বুকের জ্বালা আগুনের সাপ হয়ে ছুটোছুটি করে। একদিন, দুদিন, তিনদিন— যে-পর্যন্ত না শালবনের ডালে ময়ূরের পেখম ছড়িয়ে দিয়ে হিমালয়ের চুড়ো থেকে আসা নীল মেঘে ধারাবর্ষণ নামে।

জঙ্গল যেখানে হাল্‌কা হয়ে এসেছে সেখানে ভুটানিদের একটা ছোট বস্তি। দেশটা কিন্তু ভুটান নয়— বাঙলাদেশের একেবারে উত্তরাঞ্চল। পাহাড়, ঝরনা, জঙ্গল আর চা-বাগান। চা আর কাঠের প্রয়োজনে একটু দূরেই ঘন বনের মধ্যদিয়ে ছোট একটি রেললাইন— তার উপর দিয়ে যে রেলগাড়ি চলে তা আরো ছোট। বুনোহাতি দেখলে ইঞ্জিন ব্যাক্ করে— শালগাছ পড়লে গাড়ির চলাচলতি বন্ধ হয়ে থাকে। নন্‌রেগুলেটেড্ অঞ্চল, থানা-পুলিশের উপদ্রবটা গৌণ বস্তু। একজন সার্কেল অফিসার আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন অথবা কী করেন সেটা নিরাকার ব্রহ্মের মতোই গুরুতর তত্ত্বচিন্তা সাপেক্ষ।

এইখানে— চা-বাগান, কাঠের কারবার আর রেললাইনের সীমানা থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে, কুলবীরের পচাইয়ের দোকান। চা-বাগান আর কাঠ-কাটা কুলিদের প্রাণরস সঞ্চয়ের কেন্দ্র। সন্ধ্যায় জঙ্গলের পথঘাট ভালো নয়, আপদবিপদের সম্ভাবনাও আছে। তবু কুলিরা এখানে আসে— দিনান্তে উগ্র মাদকতায় একবারটি গলা ভিজিয়ে না নিলে তাদের চলে না। কুলবীরের রোজগার যে প্রচুর তা নয়, তবু দিন কাটে, চলে যায় একরকম করে।

রাত বাড়ছে। জঙ্গলের আড়ালে চাঁদ উঠে আসছে মাথার উপর। কোথা থেকে চিৎকার করছে হায়না। কুলিরা একে একে উঠে পড়ল সবাই, সাঁওতাল কুলিদের মাদলের শব্দ আর জড়িত গানের সুর ক্রমে মিলিয়ে এল দূরে। হঠাৎ কুলবীরের খেয়াল হল, মেয়ে শিউকুমারী এখনো ফেরেনি। নদীতে জল আনতে গিয়েছিল, তারপর—

কুলবীরের মনটা ছলকে উঠল। জানোয়ারের পাল্লায় পড়েনি তো? ঝকঝকে ভোজালিখানা খাপে পুরে নিয়ে সবে বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় এল শিউকুমারী। একা নয়, কাঁধে ভর দিয়ে আসছে মহীতোষ। আর আসছে বললেই কথাটা ঠিক হয় না, শিউকুমারী বয়ে আনছে তাকে।

কুলবীর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ছোট ছোট মঙ্গোলিয়ান চোখদুটো বিস্ফারিত করে অস্ফুট গলায় বললে, এ কী?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শিউকুমারী বললে, চুপ। একে কিছু খেতে দিয়ে এখন শোবার ব্যবস্থা করে দাও বাবা। যা শোনবার শুনো সকালে।

কুলবীরের একটা পা কাঠে তৈরি। ১৯১৪ সালের লড়াইফেরত লোক সে। ফ্ল্যান্ডার্স, কামানের গর্জন— ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। শেলের টুকরোতে বাঁ পাখানা হয়তো উড়ে গিয়ে ইংলিশ চ্যানেলেই আশ্রয় নিয়েছে।

যুদ্ধ থামল, কুলবীর ফিরে এল দেশে। ভুটান সরকার কিছু কিছু জমিজমা দিলে, রাজভক্তির পুরস্কার। কিন্তু সেই জমি নিয়েই শেষকালে বাঁধল নানা গণ্ডগোল। বুড়ো কুলবীরের এসব ঝামেলা ভালো লাগল না। একদিন দুটো টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সব চাপিয়ে দিয়ে, ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে, জলঢাকার হিমশীতল তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে সে চলে এসেছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

তারপর দিন কেটে চলেছে। ভালোয়-মন্দে, ছোটবড় সুখ-দুঃখে। সাতবছরের মেয়ে শিউকুমারীর বয়স এখন উনিশ। দিনের-পর-দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে কুলবীর, অথর্ব হয়ে পড়ছে। একটা পায়ের অভাবে বুনোঘোড়ার মতো তেজীয়ান শরীরেও শিথিলতার সঞ্চার হয়েছে খানিকটা। অনেকটা এই কারণেই এতদিন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি শিউকুমারীর। বুড়ো বয়সে কুলবীরের অন্ধের যষ্টি।

রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায়নি, এখন প্রথম সূর্যের আলোয় দিগন্তে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি চুড়ো। শালবনকে অত ঘনবিন্যস্ত বলে বোধ হচ্ছে না। পাহাড়ের রেখাটা গাঢ় নীলিমা দিয়ে আঁকা, রাশি রাশি কুঞ্চিত রোমের মতো ঘন জঙ্গল তার সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়ে আছে।

হুঁকো হাতে নিয়ে দড়ির খাটিয়ায় বসে মহীতোষের ইতিহাস সবটা শুনল কুলবীর। চাপা তামাটে মুখখানার ওপর দিয়ে সংশয়ের নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

— এখানে কেমন করে তোমাকে থাকতে দেব বাবু? ইংরেজের মুলুক। আমার দেশ ভুটান হলে তো কথা ছিল না, কিন্তু এখানে—

পচাইয়ের একটা হাঁড়ি নিয়ে শিউকুমারী বেরিয়ে এল বাইরে। বন-জোছনায় যাকে অপরূপ স্বপ্নময়ী বলে মনে হয়েছিল, দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল ততটা সুন্দরী সে নয়। খর্ব নাসিকা, ছোট ছোট চোখ। পরনের উড়ানিটার রং বিবর্ণ। ফরসা মুখখানার ওপরে স্বাভাবিক অযত্নের একটা মলিন রেখা পড়েছে, গলার খাঁজে কালো হয়ে জমে আছে ময়লা। অপগতক্লান্তি সুস্থ শিক্ষিত মহীতোষের যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। নিতান্ত সাধারণ, নিতান্তই পথেঘাটে দেখা পাহাড়ি মেয়ে। বন-জোছনা আর সোনালি অজগরের মতো খরধার নদীর পটভূমিতে আলোর পাখায় যে ভর দিয়ে নেমে এসেছিল, সে যেন নিতান্তই অন্য লোক।

মহীতোষ কোনো জবাব দিলে না কুলবীরের কথায়, জবাবটা দিল শিউকুমারী। বললে— না বাবা, বাঙালিবাবুকে ক'টা দিন রাখতেই হবে। এখন এখান থেকে বেরোলেই অংরেজ ধরে নেবে ওকে। তুমি স্বাধীন ভুটিয়া, স্বাধীন বাঙালিকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করছ কেন?

এবার চমকাবার পালা মহীতোষের। আশ্চর্য, এমন একটা কথা এই নোংরা পাহাড়ি মেয়েটা বলতে পারল কী করে? এ কি স্বাধীন পাহাড়ি রক্তের থেকে স্বতোৎসারিত অথবা এই আরণ্যক উন্মুক্ত পৃথিবীর প্রভাব? মহীতোষ তাকিয়ে রইল শিউকুমারীর দিকে। সুগঠিত দেহ— লালিত্যের চাইতে দৃঢ়তা বেশি। ছোট ছোট চোখদুটোতে শাণিত দৃষ্টি । কানে রুপোর দুটো প্রকাণ্ড আভরণ— বাঙালি মেয়ের নরম কান হলে ছিঁড়েই নেমে পড়ত। এক লহমায় মনে হল ভুটানের স্বাধীন সৈনিকের জন্ম দেবার অধিকারিণী বীরমাতাই বটে।

কিন্তু কথাটা কুলবীরের মনে ধরেছে। স্বাধীন জাত— প্রতিদিন বিদেশি শৃঙ্খলের অপমান বয়ে বেড়াতে হয় না। তাছাড়া নিজে লড়াই করেছে— কাদামাখা বোমাবিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে, ফাটা

শেলের ফুলঝুরিতে, রাশি রাশি বুলেটের মধ্যে, বেয়নেটের ধারালো ফলায়। সৈনিকের মর্যাদা সে বোঝে। আর তাছাড়া মহীতোষও সৈনিক বই-কি। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে যে সে-ই তো সৈনিক।

কুলবীর চিন্তিত মুখে হুঁকোয় টান দিয়ে বললে : আচ্ছা, থাকো। এখন কোনো ভয় নেই— এবেলা লোকজনের আমদানি হয় না জঙ্গলে। কিন্তু বিকেলে চা-বাগান থেকে সব আসে, তাদের সামনে পড়লে বিপদ হতে পারে।

শিউকুমারী বলল, সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি ঠিক করে নেব।

মহীতোষ কৃতজ্ঞ গাঢ়চোখে একবার তাকাল শিউকুমারীর আনন্দিত উজ্জ্বল মুখের দিকে। অস্পষ্ট গলায় বললে, তোমার দয়া থাপাজি।

— না, না, দয়া আর কিসের! এসেছ, থাকো দুদিন। — কুলবীর অল্প একটু হাসল, তারপর কাঠের পায়ে খটখট করে ঘরের ভেতরে চলে গেল। আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু সংশয় কাটছে না।

থাকার অনুমতি মিলল, কিন্তু মহীতোষ ভাবতে লাগল, থাকা কি সত্যিই সম্ভব! পাহাড়িদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর— ঝোপড়ি। দড়ির খাটিয়া। পচাইয়ের উগ্র দুর্গন্ধ। চারদিকে নীল জঙ্গল, পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখে কারাগারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের প্রকাণ্ড বিক্ষুব্ধ জগৎটাতে ইতিহাসের দ্রুত আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী যে ঘটে চলেছে তা এখান থেকে জানবার বা অনুমান করবারও উপায় নেই। এ কি আশ্রয়, না আন্দামানে নির্বাসন?

শিউকুমারী এগিয়ে এল। পাহাড়ি মেয়ের সহজ নিঃসংশয়তায় একখানা হাত রাখল মহীতোষের কাঁধের উপর। বললে : বাঙালিবাবু, কী ভাবছ?

মহীতোষ অন্যমনস্কভাবে বললে, কিছুই তো ভাবছি না।

— না, কিছুই ভাবতে হবে না। কোনো ভয় নেই তোমার, অংরেজ এখানে তোমাকে খুঁজে পাবে না!

মহীতোষ ম্লান হাসল : ঠিক জানো তুমি?

— জানি বই-কি! কিন্তু এখানে থাকতে হলে তো বসে বসে ভাবলে চলবে না। কাজ করতে হবে । চলো, জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনি।

একটা কিছু করবার সুযোগ পেয়ে যেন হাল্‌কা হয়ে গেল অনিশ্চিত অস্বস্তির বোঝাটা। মহীতোষ উঠে দাঁড়াল, বললে : চলো।

শালবনের পথ। নিচের দিকটা দাবানলে জ্বলে গেছে এখানে-ওখানে। শাল-শিশুরা আগুনে পুড়ে গিয়ে কালো কালো কতকগুলো খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। কিন্তু আগুনে পুড়েছে বলেই ওরা মরবে না। এ হচ্ছে ওদের জীবনশক্তির প্রথম পরীক্ষা, ভাবীকালে বনস্পতি হওয়ার গৌরব লাভ করবার পথে প্রথম অগ্নি-অভিষেক। তিন-চার বছর দাবানল ওদের ডাল পাতা পুড়িয়ে নির্জীব করে দেবে, কিন্তু তার পরেই অগ্নি উপাসক ঋত্বিকের মতো নির্দাহন শক্তি লাভ করবে ওরা। দিনের-পর-দিন বড় হয়ে উঠবে— ঋজু হয়ে উঠবে— নিজেদের বিস্তীর্ণ করে দেবে, ডুয়ার্স থেকে টেরাই পর্যন্ত।

ডালে ডালে পাখি। চেনা-অচেনা, নানা জাতের, নানা রঙের। ময়ূর আর বনমুরগির ছুটোছুটি। চকিতের জন্যে দেখা দিয়েই বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যায় হরিণের পাল। এখান ওখান দিয়ে ঝোরার জল। দুপাশে সবুজ ঘন বিন্যস্ত ঝোপ, বড় বড় ঘাস, অসংখ্য বুনোফুল। পায়ে পায়ে ভূঁইচাঁপার নীল-বেগুনি মঞ্জরী।

কাঠ আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে চলেছে দুজনে। বেশ লাগছে মহীতোষের। জীবনের রূপটা যে এত বিচিত্র, এমন মনোরম, এ কথা আগে কি কখনো কল্পনা করতে পারত মহীতোষ? কিন্তু আর নুয়ে নুয়ে খড়ি কুড়োতে পারা যায় না। পিঠটা টনটন করছে।

শিউকুমারী ডাকল, বাঙালিবাবু!

মহীতোষ চোখ তুলে তাকাল : কী বলছ?

— হাঁপিয়ে গেছ তুমি। এসব কাজ কি তোমাদের পোষায়? এসো, জিরিয়ে নিই।

একটা শালগাছের গোড়ায় শুকনো পাতার স্তূপের উপর বসল দুজনে। নীল, ঠাণ্ডা ছায়া, খসখসে শালের পাতায় বাতাসের শিরশিরানি। ঘুঘু ডাকছে। ভূঁইচাঁপার উপরে উড়ে বসছে নানা রঙের বুনো প্রজাপতি। গাছের ডালে ডালে বানর লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। শান্ত, সুন্দর, ঘুমন্ত অরণ্য। হিংস্র রাত্রির অবসানে জানোয়ারেরা হয়তো ঝোপ আর ঘাসবনের ভেতরে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখন।

শিউকুমারী আস্তে আস্তে বললে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাঙালিবাবু?

মহীতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল : না, কষ্ট আর কিসের?

— কষ্ট নয়? দেশ-গাঁ ছেড়ে কোথায় এসে পড়েছ। এখানে জঙ্গল, আমরা জংলা মানুষ। এ তো তোমার ভালো লাগবার কথা নয়।

মহীতোষ মৃদু হাসল : কিন্তু ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো নিশ্চয়ই।

— তা সত্যি।

শিউকুমারীর মনটা হঠাৎ ভারাতুর হয়ে উঠল। শুধু এইটুকুই ভালো, ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো? তার চাইতে আরো কিছু ভালো নেই কি এখানে? জঙ্গলের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া— হাওয়ায় ঝরে পড়া শালের ফুল। রাত্রিতে মাতাল করা বন-জোছনা। জলঢাকার কলরোল। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার মুকুট। দূরের পাহাড়ে পাথরকাটা পথের উপর যখন জংলা কলার পাতা হাওয়ায় কাঁপে, জানোয়ারের পায়ে লেগে গড়িয়ে পড়া পাথরের শব্দে যখন মনে হয় দূরবাসী পিতম ঘোড়া ছুটিয়ে অভিসারে আসছে, তখন শিউকুমারীর ইচ্ছে করে—

কিন্তু শিউকুমারীর যে ইচ্ছে করে, সে ইচ্ছে মহীতোষের নয়। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ। ছাব্বিশে জানুয়ারি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাত্রির তপস্যা। আগস্ট আন্দোলন— ডু অর ডাই। সেই জগৎ থেকে, সেই আন্দোলিত আবর্তিত বিপুল জীবন থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল সে? বিক্ষুব্ধ বোম্বাই— উন্মত্ত কলকাতা। পথে পথে 'বন্দেমাতরম্'। লাঠি, বন্দুক, রক্ত, আইন। চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ঘুরে যায় সমস্ত। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে— সেই গর্জিত সমুদ্রের তরঙ্গে আফ্রিকার বনভূমির শিলাসৈকতের মতো জীবনের একটা অজ্ঞাত তটে নিক্ষিপ্ত হয়েই পড়ে থাকবে সে? আকাশে যেখানে ঘূর্ণিত নক্ষত্রমালায় আর জ্বলন্ত নীহারিকায় ভাঙা-গড়ার প্রলয় চলেছে, সেখান থেকে কক্ষভ্রষ্ট মৃত্যুসমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে থাকবে নিবে যাওয়া উলকা?

মহীতোষ বললে, দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ তোমরা। এ ঋণ কী করে শোধ হবে জানি না।

— দয়ার ঋণ আমরা শোধ নিই না বাঙালিবাবু। শিউকুমারীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।— সে আমাদের নিয়ম নয়। কিন্তু চলো, বেলা উঠে গেল।

খোঁচা খেয়ে মহীতোষ আশ্চর্য হয়ে গেল। এ আকস্মিক তীক্ষ্ণতার অর্থ কী? ডুয়ার্সের জঙ্গলের মতোই জংলি মেয়ের চরিত্র বুঝবার চেষ্টা করা বৃথা।

ছোট কাঠের বোঝাটা মহীতোষ তুলে নিল নির্ঃশব্দে।

শালবনের ছায়ামেদুর কবিতায় ছন্দোপতন হয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে বুনোহাতির ডাক। জলঢাকার কলগর্জন ছাপিয়ে মেঘমন্দ্রের মতো সে ডাক ভেসে এল।

কক্ষভ্রষ্ট উলকা। কিন্তু নিবতে চায় না— বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে অবিরাম। তবু উপায় নেই, থাকতে হবে; অন্তত ক'টা দিনের জন্যে আশ্রয় নিতে হবে— যে পর্যন্ত অরবিন্দ ফিরে না আসে। আর মহীতোষ জানে, মনের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই জানে, অরবিন্দ ফিরে আসবেই। যেখানে থাক, যেমন করে থাক, তাকে খুঁজে বার করবেই। মৃত্যুর হাত এড়ানো চলে, কিন্তু অরবিন্দের চোখকে এড়াবার উপায় নেই। তার দুটো চোখ যেন লক্ষ লক্ষ হয়ে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

তবু দিন কাটে। খড়ি কুড়োয়, কুলবীরের গাদা বন্দুক নিয়ে বনমুরগি শিকার করে, হরিণের সন্ধান করে। জঙ্গলের মধ্যদিয়ে চলতে চলতে মনে হয় এখনি হয়তো কোথা থেকে একটা ছায়ামূর্তির মতো অরবিন্দ সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু অরবিন্দ আসে না। যেখান-সেখান থেকে বনলক্ষ্মীর মতো দেখা দেয় শিউকুমারী। কাঁখে কলসি, ভিজে শাড়ি সুললিত দেহের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে-ভাঁজে জড়িয়ে রয়েছে। মৃদু হেসে চোখের তীব্র চাহনি হেনে বলে, শিকার মিলল?

থমকে দাঁড়িয়ে যায় মহীতোষ। দৃষ্টিটাকে বন্দি করে ফেলে শিউকুমারীর অনিন্দ্য দেহসুষমা। মনে রঙ লাগে। নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে অবচেতনার স্বীকারোক্তি : মিলল বলেই তো মনে হচ্ছে।

শিউকুমারীর দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে যায় : সত্যি?

— সত্যি। — যেন অদৃশ্য শয়তানের শৃঙ্খলে টান লাগে, একপা একপা করে এগিয়ে যায় মহীতোষ : অনেক খুঁজে এইবার পাওয়া গেল বলে ভরসা হচ্ছে।

শিউকুমারী আর দাঁড়ায় না। দেহভঙ্গিমার উন্মত্ত আলোড়ন রক্তের কণায় কণায় জাগিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। আর পরক্ষণেই যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায় মহীতোষের। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়, মনে হয় একান্তভাবে ব্রতচ্যুত, যোগভ্রষ্ট। শেষপর্যন্ত এই দাঁড়াল? ছাব্বিশে জানুয়ারির সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে বনে বনে প্রেম করে বেড়াচ্ছে সে?

দুহাতে মাথাটা টিপে ধরে মহীতোষ। নাহ্, আর নয়। এ কোন্ জালে দিনের-পর-দিন জড়িয়ে পড়ছে সে? স্বাধীনতার সৈনিক— শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের কান্নায় কন্যাকুমারী থেকে গৌরীশেখরের তুহিন্ শৃঙ্গ অবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ কী মোহ তার! এইভাবেই সে কি তার কর্তব্য পালন করছে?

বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত পচাই-লোভী কুলি আর পাহাড়িদের আড্ডা বসে কুলবীরের দোকানে। কাঠের পা কুলবীর একা সব দেখাশোনা করতে পারে না; শিউকুমারী কাজে সহায়তা করে তার। মৃদু হাসির সঙ্গে ক্রেতার দিকে এগিয়ে দেয় পচাইয়ের ভাঁড়। মনে রঙ লাগে; নেশার রঙ— শিউকুমারীর চোখের রঙ। ভুল করে খরিদ্দারেরা বেশি পয়সা দিয়ে ফেলে।

আর সেই সময়ে কুলবীরের একটা ঢোলা হাফপ্যান্ট পরে ঘরের পেছনে একটা চৌপাইয়ের উপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মহীতোষ। এই সময়টাই তাকে অজ্ঞাতবাস করতে হয়। কুলিরা আসে, কুলিদের সরদার আসে। ফরেস্ট অফিসের দু-চারজন আধা-বাবুরও পদপাত ঘটে। ওখান থেকে হৈচৈ শোনা যায়, হুল্লোড় শোনা যায়, দুর্বোধ্য গানের কলি শোনা যায়, উন্মত্ত হাসিতে কুলবীরের ছোট ঝুপড়িটা যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে। আর সবকিছুর ভেতর দিয়ে একটা তরল তীক্ষ্ণ হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে— শিউকুমারী হাসছে।

মোহ কাটাতে চায় মহীতোষ। কিন্তু মোহ কি সত্যিই কাটে? শিউকুমারী হাসছে — পাহাড়ি মেয়ে পচাই বিক্রির খরিদ্দারদের খুশি করবার জন্যে তার অভ্যস্ত হাসি হাসছে! তাতে মহীতোষের কোনো ক্ষতি নেই। তাহলে বুকের মধ্যে জ্বালা করে কেন, কেন মনে হয় শিউকুমারী তাকে ঠকাচ্ছে?

বন-জোছনা শেষ হয়ে গেছে, এসেছে অমাবস্যা, আরণ্যক তমসা। অন্ধকারের মধ্যে মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে ছেঁকে ধরে তাকে। বুকের মধ্যে অসহায় কান্নার রোল ওঠে— অরবিন্দ, অরবিন্দ? এমন সময় তাকে ফেলে কোথায় চলে গেল অরবিন্দ?

নিজে চলে যাবে? এখুনি চলে যাবে এই কালো অন্ধকার ঘেরা শালবনের ভেতর দিয়ে কালিমাখা জলঢাকার তীক্ষ্ণ ধারা পার হয়ে? কিন্তু মন তাতেও উৎসাহ পায় না। কে যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। একা চলে যেতে ভয় করে, ভয় করে আবার কোনো একটা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়িদের এই ছোট ঘরেই কি সে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেল, হারিয়ে ফেলল পথ চলার ক্ষমতা? অরবিন্দ— এ সময়ে যদি অরবিন্দ থাকত!

কুলবীরের দোকানে কলরব ক্রমশ কমে আসছে। শিউকুমারীর হাসির আওয়াজ আর শোনা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে ঠুনঠুন করে মিষ্টি শব্দ। কাঠের বাক্সের উপর বাজিয়ে বাজিয়ে পয়সা গুণছে কুলবীর।

হঠাৎ কেরোসিনের টেমির আলো এসে মুখে পড়ে মহীতোষের। প্রদীপ হাতে বনরাজ্যের মালবিকা। চোখে সকৌতুক দৃষ্টি : চলো বাঙালিবাবু, ঘরে চলো। ওরা পালিয়েছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহীতোষ উঠে পড়ে। ঠিক প্রথমদিনটির মতোই হাত বাড়িয়ে দেয় শিউকুমারী : এসো, এসো!

আর কিছু মনেও থাকে না। একটু আগেকার তীব্র হাসির জ্বালাটাও তেমনি করে আর কানের মধ্যে বিঁধতে থাকে না। এই মেয়েটি কি ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে!

দিন কাটছিল— কিন্তু আর কাটল না। জীবনের অপরিহার্য জটিলতা এসে দেখা দিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে পচাইয়ের দোকানে কাঠের কারবারি বলদেও আবির্ভূত হল। একমুখ কুটিল হাসি বিস্তার করে বললে, ভালো আছ শিউ?

শিউকুমারীর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, কুলবীর তাকালো সন্দিগ্ধ ভীত দৃষ্টিতে। সাংঘাতিক লোক বলদেও। পচাইতে তার নেশা নেই— কোনো মতলব না থাকলে এদিকে পা দিত না সে। কিন্তু কী সে মতলব?

কুলবীর অনুমান করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বলদেও প্রতিপত্তিশালী লোক। যেমন কূটবুদ্ধি, তেমনি নির্মম। তাকে ভয় না করে এমন লোক নেই। তবু শিউকুমারী ভয় করেনি তাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার হাত চেপে ধরে প্রণয় নিবেদন করেছিল বলদেও। বলেছিল, যত টাকা চাস—

কিন্তু কথাটা শেষ হয়নি। প্রকাণ্ড চড়টার বিভ্রম থেকে আত্মস্থ হয়ে বলদেও যখন মাথা তুলেছিল, তখন জলঢাকার বালিবিস্তারের উপর একটি প্রাণীরও চিহ্ন নেই। শুধু নদীর গর্জন পরিহাসের মতো বাজছে।

টাট্টু ছুটিয়ে বলদেও চলে গিয়েছিল। কিন্তু চড়ের জ্বালাটা যে সে ভোলেনি, সহজে ভুলবেও না— এ কথা শিউকুমারীও জানত।

বিবর্ণ মুখে শিউকুমারী বললে, ভালোই আছি।

— হুঁ, খুব ভালো আছ বলেই মনে হচ্ছে?— আবার নির্মমভাবে বলদেও হাসল। ছোট ছোট চোখদুটোয় ঝিকিয়ে উঠল পাহাড়ি প্রতিহিংসার সর্পিল চমক।

বলদেও নেশা করে না সহজে। কিন্তু আজ তার কী হয়েছে— ভাঁড়ের পর ভাঁড় নিঃশেষ করে চলল সে। একটা দশটাকার নোট কুলবীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, চালিয়ে যাও থাপাজি।

রাত বেড়ে চলল। একে একে খরিদ্দারেরা চলে গেল সবাই। কিন্তু বলদেও ওঠে না। অধৈর্য হয়ে টাট্টুঘোড়াটা পা ঠুকছে বারে বারে, লেজের ঘা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারকে ভয় করে না বলদেও। অমিত শক্তিমান লোক— ভোজালির ঘায়ে বাঘ মারতে পারে।

কী একটা কাজে কুলবীর ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বলদেও এগিয়ে এল। শিউকুমারীর চোখের ওপর রক্তাক্ত হিংস্র চোখদুটো স্থিরনিবদ্ধ করে বললে : ফেরারি আসামিকে ঘরে জায়গা দিয়েছ?

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর কেঁপে গেল শিউকুমারীর : কে বলেছে তোমাকে?

— আমাকে ফাঁকি দেবে তুমি?— মুষ্টিগত শিকারের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্ত জিঘাংসার আনন্দে বলদেও বললে : সাত-সাতটা চোখ আছে আমার। কালই খবর যাবে ফাঁড়িতে। শুধু ওই বাঙালিবাবু নয়, হাতে দড়ি পড়বে থাপাজিরও।

শিউকুমারী আর্তনাদ করে উঠল।

বলদেও বললে, শোনো শিউ। এ খবর আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি, রেয়াৎ করতে পারি বাঙালিবাবুকেও। কিন্তু দয়া করে নয়। আজ রাতে আমি তোমার

জন্যে অপেক্ষা করব। যদি আসো, কোনো ঝামেলা হবে না। যদি না আসো, কাল সন্ধলকে ফাটকে যেতে হবে।

শিউকুমারী তাকিয়ে রইল নির্বাক চোখে।

বলদেও খাপ থেকে বার করলে ঝকঝকে ভোজালিখানা, যেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার ধার পরীক্ষা করলে একবার। বললে : টাকার জন্য ভেবো না। আমাকে খুশি করতে পারো তো যা চাও তাই দেব। যুদ্ধের বাজারে কাঠের ব্যবসা করছি জানো হয়তো। কিন্তু আজ রাতের কথা যেন মনে থাকে । যদি না যাও কাল সকালে যা হবে, তার জন্যে আমাকে দোষ দিও না।

বলদেও টলতে টলতে উঠে পড়ল ঘোড়ায়। সাত সেলের তীব্র একটা হান্টিং-টর্চের আলোয় অরণ্য উদ্ভাসিত করে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু এত ব্যাপার জানল না মহীতোষ। দড়ির খাটিয়ায় সে তখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাইরে শালের পাতায় মর্মর তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, ঝুপড়ির ফাঁকে ফাঁকে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। স্বপ্ন দেখছে সে। কিসের স্বপ্ন? ছাব্বিশে জানুয়ারির নয়, নাইন্‌থ আগস্টেরও নয়। পতাকাবাহী উন্মত্ত জনতার তরঙ্গবেগ কোথায় চাপা পড়ে গেছে বিস্মৃতির অতলতায়। জলঢাকার খরখরে বালির উপর বন-জোছনা। চোখে-মুখে জলের ছাট দিয়ে যে উড়ানির বাতাস দিচ্ছে, সে কি কোনো মর্মরমূর্তি? অথবা আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে নেমে আসা কোনো আলোকপরী?

চমকে ঘুম ভেঙে গেল। বুকের উপর কে যেন আছড়ে পড়েছে এসে। বড় বড় নিশ্বাস মুখের উপর এসে পড়ছে— অনুভব করা যাচ্ছে তার উত্তেজিত প্রসরণশীল হৃৎপিণ্ডের উৎক্ষেপ। কেরোসিনের টেমির আলোয় মহীতোষ দেখলে, শিউকুমারী!

— চলো, পালাই আমরা! আমাকে নিয়ে চলো তুমি!

আকস্মিক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে মহীতোষ দুহাতে পাহাড়ি মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে : কোথায় যাব?

শিউকুমারীর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, অসহ্য আবেগে থরথর করে গলা কাঁপছে তার : যেখানে তোমার খুশি।

মহীতোষ ক্রমশ আত্মস্থ হয়ে উঠছে, কিন্তু কী করে নিয়ে যাব তোমাকে? এখান থেকে শুধু-হাতে তো পালানো চলে না। পদে পদে বিপদ! সেসব এড়াবার জন্যে টাকা দরকার। অনেক দূরদেশে তো যেতে হবে, টাকা নইলে চলবে কী করে?

— টাকা ! শিউকুমারী বলে বসল : কত টাকা চাই তোমার?

— দুশো-তিনশো। তাহলে তোমাকে নিয়ে সিকিম চলে যেতে পারব, চলে যেতে পারব একেবারে গ্যাংটকে। সেই ভালো। সেখানে গিয়েই ঘর বাঁধব আমরা। যা পেছনে পড়ে আছে, পেছনেই পড়ে থাক্— মহীতোষের যেন নেশা লেগেছে : নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা।

দুশো-তিনশো! শিউকুমারী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা? কুলবীরের বাক্স হাতড়ালে কুড়িটা টাকার বেশি একটি আধলাও পাওয়া যাবে না, এ কথা তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে!

মহীতোষ লোভীর মতো হাত বাড়াল।

কিন্তু সরে দাঁড়াল শিউকুমারী। দুশো টাকা ! বলদেও আজ সারারাত প্রতীক্ষা করে থাকবে। চিন্তাগুলো একসঙ্গে আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুপুঞ্জের মতো ফুটতে লাগল। মাত্র একবার। একটি রাত্রির অশুচিতা । তারপরে যে জীবন আসবে, তার পবিত্র নির্মল স্রোতে ধুয়ে যাবে সমস্ত, মুছে যাবে সমস্ত গ্লানি আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

মহীতোষ বললে, বুকে এসো।

— টাকার যোগাড় করে আনছি।— ঘর থেকে মাতালের মতো বেরিয়ে গেল শিউকুমারী।

চিন্তার মধ্যে আগুন জ্বলে যাচ্ছে— যেন এক পাত্র চড়া মদ খেয়েছে সে। দুষ্ট ক্ষুধা বলদেওয়ের। এক রাত্রের জন্যে তিনশো টাকা খরচ করবে, এমন বেহিসেবি সে নয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে, যতদিন শিউকুমারীর যৌবন থাকে, ততদিন তাকে দলিত মথিত করে লুটে নেবার জন্যেই বলদেওয়ের এই কৌশল। এই ফাঁদে আরো অনেকেই পড়েছে।

কিন্তু শিউকুমারীর পক্ষে মাত্র এক রাত্রি। সমস্ত জীবনের জন্যে একটি রাত্রির চরম গ্লানি, চূড়ান্ত অপমানকে মেনে নেবে সে। তারপর কাল, পরশু ? তখন হয়তো তারা ভুটানের পাহাড় পেরিয়ে চলেছে সিকিমের দিকে। সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র জ্বরের জ্বালা নিয়ে ডিলিরিয়ামের রোগী যেমন উঠে বসতে চায়, ছুটে যেতে চায়, তেমনি করেই শিউকুমারী অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বিছানার উপরে বিহ্বল হয়ে বসে রইল মহীতোষ। তার রক্তে রক্তে এ কী আশ্চর্য দোলা ! যেন নিশি পেয়েছে তাকে। তাই নিজের অতীতজীবনের সঙ্কল্প, সব মিথ্যা আর মায়া হয়ে গেছে। নতুনের আহ্বান— বহু বিচিত্র— বহু ব্যাপক অনাস্বাদিত জীবনের আহ্বান। এই পুলিশের তাড়া— এই বিব্রত বিড়ম্বিত মুহূর্তগুলো— এদের ছাড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ক্ষতি কী, ক্ষতি কী নিজেকে ভাসিয়ে দিলে আশ্চর্য একটা অ্যাডভেঞ্চারের সমুদ্রে ?

চাপা গলায় মহীতোষ ডাকলে, শিউ শিউ !

কিন্তু শিউ এল না, এল অরবিন্দ। সত্যিই অরবিন্দ। জঙ্গলের মধ্যথেকে উঠে এল অমানুষিক মানুষ। মহীতোষের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন বরফগলা জলের শিহরণ নেমে গেল।

মহীতোষের মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে বজ্রগর্ভ কঠিন আদেশের গলায় অরবিন্দ বললে : অনেক খুঁজে তোমার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু এখানে বসে একটা পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা ছাড়াও ঢের কাজ আছে তোমার। উঠে পড়ো।

বিহ্বল ভীত গলায় প্রশ্ন এল : কোথায় ?

— পঁচিশ মাইল দূরে। ভালো শেল্টার আছে, দলের লোক আছে। ওখানে থেকে শহরে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক বেশ করা চলবে। উঠে পড়ো।

— এখনি ?

— হ্যাঁ, এখনি। — মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কড়কড় করে উঠল অরবিন্দের। বাঁ-হাতে দেখা দিলে ছোট একটা কালো রিভলবার : তিন রাত পাহাড়িদের ঘরে কাটিয়েই কি আয়েশি হয়ে গেলে নাকি ?

মহীতোষ কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল। রিভলবারের সংকেতটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

অরবিন্দ বললে, বাইরে বড় ঘোড়া তৈরি আছে। দুজনকেই এক ঘোড়ায় উঠতে হবে। হারি আপ!

টর্চের আলো নিবে গেল। ঝুপড়ির মধ্যে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পচাইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দূরে ঝমঝম করে প্রচণ্ড শব্দে ভুটিয়ারা ঝাঁঝি বাজাচ্ছে— অপদেবতাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে তারা। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে কি অপদেবতার পদধ্বনিও মিলিয়ে এল?

চরম লাঞ্ছনা আর মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে সংগ্রহ করা তিনশো টাকার নোট। শিউকুমারীর হাতের মধ্যে ঘামে ভিজছে নোটের তাড়াটা। জঙ্গলের মধ্যদিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে সে। কালো অন্ধকার, একহাত দূরের মানুষও চোখে দেখা যায় না। শালের পাতায় শিরশিরানি— এখানে-ওখানে বন্যজন্তুর আগ্নেয় নয়ন।

মহীতোষ— এই কালো অন্ধকারে কোথায় মহীতোষকে খুঁজে পাবে শিউকুমারী? অরণ্য তাকে গ্রাস করেছে, নিঃশেষে তলিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। তবু অন্ধকারে শিউকুমারী খুঁজে ফিরছে। শালের চারায় পা কেটে রক্ত পড়ছে— কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। এত অন্ধকার— এমন দুশ্ছেদ্য তমসায় একটুখানি আলো যদি পাওয়া যেত!

আলো পাওয়া গেল। ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর। পটপট করে পাতা পোড়ার শব্দ— বন মুরগির ভীত কলরব চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বন-জোছনা নয়— দাবাগ্নি।

অযান্ত্রিক

সুবোধ ঘোষ

বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ওই ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড— প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ। যে নেহাত দায়ে পড়েছে বা জীবনে মোটর দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না। এমনিতে দেখতে জবুথবু, কিন্তু কাজের বেলায় অদ্ভুতকর্মা। বড় বড় চাঁইগাড়ির পক্ষে যা অসাধ্য, তা ওর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের ভাঙাচোরা ভয়াবহ জংলিপথে— ঘোর বর্ষার রাত্রে— যখন ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়িই নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটি। তাই সবাই যখন জবাব দিয়ে সরে পড়ে— একমাত্র তখন শুধু গরজের খাতিরে আসে তার ডাক, তার আগে নয়।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে সারি সারি জমকালো তরুণ নিউ মডেলের মধ্যে বিমলের বুড়ো ফোর্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়— জটায়ুর মতো তার জরাভার নিয়ে। বাস্তবিক বড় দৃষ্টিকটু। তালি-মারা হুড, সামনের রশিটা ভাঙা, তোবড়া বনেট, কালিঝুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো— সে এক অপূর্ব শ্রী। পাদানিতে পা দিলে মাড়ানো কুকুরের মতো ক্যাঁচ করে আর্তনাদ করে ওঠে। মোটা তেলের ছাপ লেগে সিটগুলো এত কলঙ্কিত যে, সুবেশ কোনো ভদ্রলোককে পায়ে ধরে সাধলেও তাতে বসতে রাজি হবে না। দরজাগুলো বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, আর যদিচ বন্ধ হল তো তাকে খোলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সিটের উপর বসলেই উপবেশকের মাথায় আর মুখে এসে লাগবে উপরের দড়িতে ঝোলানো বিমলের গামছা, নোংরা গোটা-দুই গেঞ্জি আর তেলচিটে আলোয়ান।

বিমলের গাড়ির দূরায়ত ভৈরব হর্ষ শোনামাত্র প্রত্যেকটি রিকশা সভয়ে রাস্তার শেষ কিনারায় সরে যায়— অতি দুঃসাহসী সাইক্লিস্টেরও বিমলের ধাবমান গাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে বুক কাঁপে। রাত্রির অন্ধকারে এক-একবার দেখা যায়, দূর থেকে যেন একটা একচক্ষু দানব অট্টশব্দে হা-হা করে তেড়ে আসছে— বুঝতে হবে ওইটি বিমলের গাড়ি। হেডলাইটের আলো নির্বাণপ্রাপ্ত, আলগা আলগা শরীরের গাঁটগুলো— যে কোনো সময়ে বিস্ফোরকের মতো শতধা হয়ে ছিটকে পড়বে বোধহয়।

সবচেয়ে বেশি ধুলো ওড়াবে, পথের মোষ খ্যাপাবে, আর কানফাটা আওয়াজ করবে বিমলের গাড়ি। তবু কিছু বলবার জো নেই বিমলকে। চটাং চটাং মুখের ওপর দু-কথা উল্টো

শুনিয়ে দেবে : মশাই বুঝি কোনো নোংরা কম্ম করেন না— চেঁচান না, দৌড়ান না? যত দোষ করেছে বুঝি আমার গাড়িটা!

কত রকমই না বিদ্রূপ আর বিশেষণ পেয়েছে এই গাড়িটা— বুড়ো ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস, কানা ভঁইস! কিন্তু বিমলের কাছে সে জগদ্দল— এই নামেই বিমল তাকে ডাকে, তার ব্যস্তত্রস্ত কর্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরোটি বছরের সাথী এই যন্ত্রপশুটা— সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।

সন্দেহ হতে পারে, বিমল তো ডাকে, কিন্তু সাড়া পায় কি? এটা অন্যের পক্ষে বোঝা কঠিন। বিমল খুবই বোঝে,... জগদ্দলের প্রতিটি সাধ-আবদার-অভিমান বিমল এক পলকে বুঝে নিতে পারে।

'ভারি তেষ্টা পেয়েছে, না রে জগদ্দল? তাই হাঁসফাঁস কচ্ছিস? দাঁড়া বাবা দাঁড়া।' জগদ্দলকে রাস্তার পাশে একটা বড় বটগাছের ছায়ায় থামিয়ে, কুয়ো থেকে বালতি ভরে ঠাণ্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে জল ঢেলে দেয়। বগবগ করে চার-পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদ্দল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।

এ ট্যাক্সির মালিক ও চালক বিমল স্বয়ং। আজ নয়, একটানা পনেরো বছর ধরে।

স্ট্যান্ডের এককোণে তার সব দৈন্য আর জরাভার নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো জগদ্দল। পাশে হাল-মডেল গাড়িটার সুমসৃণ ছাইরঙা বনেটের উপর গা এলিয়ে বসে পিয়ারা সিং বিমলকে টিটকারি দিয়ে বলে— 'আর কেন এ বিমলবাবু? এবার তোমার বুড়িকে পেনশন দাও।'

— 'হুঁ, তারপর তোমার মতো একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে রাখি।' বিমল সটান উত্তর দেয়। পিয়ারা সিং আর কিছু বলা বাহুল্য মনে করে; কারণ বললেই বিমল রেগে যাবে, আর তার রাগ বড় বুনো ধরনের।

কার্তিক পূর্ণিমায় একটা মেলা বসবে এখান থেকে মাইল-বারো দূরে; সেখানে আছে নরসিংহদেবের বিগ্রহ নিয়ে এক মন্দির! ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে যাত্রীর ভিড়। চটপট ট্যাক্সিগুলো যাত্রী ভরে নিয়ে হুসহুস করে বেরিয়ে গেল। শূন্য স্ট্যান্ডে একা পড়ে থেকে শুধু ধুঁকতে লাগল বুড়ো জগদ্দল। কে আসবে তার কাছে? ওই প্রাগৈতিহাসিক গঠন আর পৌরাণিক সাজসজ্জা।

গোবিন্দ এসে সমবেদনা জানিয়ে বলল, 'কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না?'

—'না।'

—'তবে?'

—'তবে আর কী? এর শোধ তুলব সন্ধেয়। ডবল ওভারলোড নেব, যা থাকে কপালে।'

আমিও যন্ত্র। বেঙ্গলি ক্লাব বলেছে ভালো। — বিমল খুশি হয়ে মনে মনে হাসে। কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষের মতোই, এ তো বেঙ্গলি ক্লাব বোঝে না, এইটেই যা দুঃখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে বাজারে ভিড়ে— এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে! আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরিব— জগদ্দল যেন একটু বোঝে!

আরবি ঘোড়ার মতো প্রমত্ত বেগে জগদ্দল ছুটে চলেছে রাঁচীর পথে। শাবাশ তার দম, দৌড় আর লোড টানার শক্তি। কম্পমান স্টিয়ারিং হুইলটাকে দুহাতে আঁকড়ে বুক ঠেকিয়ে

বিমল ধরে রয়েছে। অনুভব করেছে দুঃশীল জগদ্দলের প্রাণস্ফূর্তি শিহর। কনকনে মাঘী হাওয়া ইস্পাতের ফলার মতো চামড়া চেঁছে চলে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো কম্ফোটারটা দু-কানের উপর টেনে নামিয়ে দিল— বিমলের বয়স হয়েছে, আজকাল ঠাণ্ডাফাণ্ডা সহজে কাবু করে দেয়।

সুমুখে পড়ল একটা পাহাড়ি ঘাট— এই সুবিসর্পিত চড়াইটা জগদ্দল রুষ্ট চিতাবাঘের মতো একদমে গোঁ-গোঁ করে কত কতবার পার হয়ে গেছে; সেদিনও অভ্যস্ত বিশ্বাসে ঘাটের কাছে এসে বিমল চাপল এক্সিলেটার পুরো চাপ। জগদ্দল পঞ্চাশ গজ এগিয়ে খং খং করে ককিয়ে উঠল। যেন তার বুকের ভেতর ক'টা হাড় সরে গিয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে বিমল শুনল সে আওয়াজ! না ভুল নয়, সেরেছে আজ জগদ্দল— পিস্টন ভেঙে গেছে!

ক'দিন পরে মাঝপথে এমনি আকস্মিকভাবে বেয়ারিং গলে গিয়ে একটা বড় রিজার্ভ নষ্ট হয়ে গেল। তারপর একটা-না-একটা উপসর্গ লেগেই রইল! এটা দূর হয় তো ওটা আসে! আজ ফ্যানবেল্ট ছেঁড়ে, কাল কারবুরেটারে তেল পার হয় না, পরশু প্লাগগুলো অচল হয়ে পড়ে— শর্ট সারকিট হয়।

এতবড় বিশ্বাসের পাহাড়টা শেষে বুঝি টলে উঠল। বিমল ক'দিন থেকে অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ— এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়। জগদ্দলেরও নিয়মভঙ্গ হয়েছে— স্ট্যান্ডে আসা বাদ পড়ছে মাঝে মাঝে। উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুরদুর করে। তবে কি শেষে সত্যই জগদ্দল ছুটি নেবে?

— 'না আমি আছি জগদ্দল; তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভয় নেই।' মোটরবিশারদ পাকা মিস্ত্রি বিমল প্রতিজ্ঞা করল।

কলকাতায় অর্ডার দিয়ে আনাল প্রত্যেকটি জেনুইন কলকব্জা। নতুন ব্যাটারি, ডিস্ট্রিবিউটর, এক্সেল, পিস্টন— সব আনিয়ে ফেলল। অকৃপণ হাতে শুরু হল খরচ; প্রয়োজন বুঝলে রাতারাতি তার করে জিনিস আনায়। রাত জেগে খুটখাট মেরামত, পার্টস বদল আর তেলজল চলেছে। জগদ্দলকে রোগে ধরেছে— বিমল প্রায় খেপে উঠল। অর্থাভাব— বেচে ফেলল ঘড়ি, বাসনপত্র, তক্তপোশটা পর্যন্ত।

সর্বস্ব তো গেল, যাক্। পনেরো বছরের বন্ধু জগদ্দল এবার খুশি হবে, সেরে উঠবে। খুব করা গেছে যাহোক; এবার নতুন হুড, রং আর বার্নিশ পড়লে একখানি বাহার খুলবে বটে।

রাত্রিদুপুরে জগদ্দলকে গ্যারেজে বন্ধ করার সময় বিমল একবার আলো তুলে দেখে নিল। খুশি উপচে পড়ল তার দুচোখে!— এই তো বলিহারী মানিয়েছে জগদ্দলকে! ক'দিনের অক্লান্ত সেবায় জগদ্দলের চেহারা গেছে ফিরে; দেখাচ্ছে যেন একটি তেজি পেশিঅলা পালোয়ান। এক ইশারায় দঙ্গলে ভিড়ে যেতে প্রস্তুত! হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল বিমল— বড় পরিশ্রমের চোট গেছে ক'দিন। কিন্তু কী আরামই না লাগছে ভাবতে— জগদ্দল সেরে উঠেছে; কাল সকালে সগর্জনে নতুন হর্নের শব্দে সচকিত করে জগদ্দলকে নিয়ে যখন স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াবে— বিস্ময়ে হতবাক্ হবে সব, আবার জ্বলবে হিংসেতে।

হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। শেষ রাত্রি তবু নিরেট অন্ধকার। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল বিমল— জগদ্দল ভিজছে না তো! গ্যারেজের টিনের ছাদটা যা

পুরনো, কত ফুটো-ফাটাল আছে কে জানে! কোনো ফাঁকে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে হয়েছে আর কী! বডির নতুন পালিশটাকেও স্রেফ ঘা করে দেবে।

হারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে বিমল প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : আরে হায়! হায়! ছাদের ফুটো দিয়ে ঝপ্‌ঝপ্ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে ঠিক ইঞ্জিনের উপর। দৌড়ে শোবার ঘর থেকে নিয়ে এল তার বর্ষাতিটা; টেনে আনল বিছানার কম্বল শতরঞ্জি চাদর।

ইঞ্জিনের ভেজা বনেটটা মুছে ফেলে কম্বলটা চাপিয়ে দিল— তার উপর বর্ষাতিটা! শতরঞ্জি আর চাদর দিয়ে গাড়িটার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল ভেতরে; নতুন নরম গদিটার উপর গুটিশুটি মেরে বিমল শুয়ে পড়ল; আরামে তার দুচোখে ঘুমের ঢল এল নেমে।

পরদিনের ইতিহাস। স্ট্যান্ডের উদ্‌গ্রীব জনতা জগদ্দলকে ঘিরে দাঁড়াল— যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে। স্তুতিমুখর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিমলের অপূর্ব মিস্ত্রিপ্রতিভার নিদর্শন। বিমল টেনে টেনে কয়েকবার হাসল। কিন্তু কেমন যেন একটু অস্বচ্ছ সে হাসি, একটা শঙ্কার ধূসর স্পর্শে আবিল।

কেন? বিমলের মন গেছে ভেঙে। জগদ্দল চলেছে সত্যি, কিন্তু কই সেই স্টার্ট মাত্র শক্তির উচ্চকিত ফুকার, সেই দর্পিত হ্রেষাধ্বনি আর দুরন্ত বনহরিণের গতি।

শহর থেকে দূরে একটা মাঠের ধারে গিয়ে বিমল বেশ করে জগদ্দলকে পরীক্ষা করে দেখল।

—'চল্ বাবা জগদ্দল! একবার পক্ষীরাজের মতো ছাড়্ তো পাখা।' চাপল এক্সিলেটার! নাহ্ বৃথা, জগদ্দল অসমর্থ।

ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড— প্রত্যেকটি গিয়ার পরপর পাল্টে টান দিল। শেষে রাগ চড়ে গেল মাথায়— চল্, নইলে মারব লাথি।

অক্ষম বৃদ্ধের মতো জগদ্দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে খানিকদূর দৌড়াল!

—'আদর বোঝে না, স্নেহ বোঝে না শালা লোহার— বাচ্চা, নির্জীব ভূত'— বিমল সত্যি সত্যি ক্লাচের উপর সজোরে দুটো লাথি মেরে বসল।

বিমলের রাগ ক্রমশ বাড়ছে, সেই বুনো রাগ! আজ শেষ জবাব জেনে নেবে সে! জগদ্দল থাকতে চায়, না, যেতে চায়। অনেক তোয়াজ করেছে সে, আর নয়।

রাগে মাথাটা খারাপই হয়ে গেল বোধহয়। বিমল ঠেলে ঠেলে দু-মণি সাত-আটটা পাথর নিয়ে এল— ঘামে ভিজে ঢোল হয়ে গেল তার খাকি কামিজ। এক-এক করে সব পাথরগুলো গাড়িতে দিল তুলে— একেই বলে লোড!

চল্! জগদ্দল চলল; গাঁটে গাঁটে আর্তনাদ বেজে উঠল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। অসমর্থ— আর পরে পারবে না জগদ্দল এ ভার বইতে।

এইবার বিমল নিশ্চিন্ত। জগদ্দলকে যমে ধরেছে— এ সত্যে আর সন্দেহ নেই। এত কড়া কল্‌জে জগদ্দলের, তাতেও ঘুণ ধরল আজ। কৃতান্তের কীট... আর রক্ষে নেই, এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদ্দল।

আমি শুধু রৈনু বাকি ...পরিশ্রান্ত বিমল মনে মনে যেন বলে উঠল।— কিন্তু আমারো তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে, রগগুলো জোঁকের মতো গা ছেয়ে ফেলেছে সব।

— 'জগদ্দল আগে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা। যা জগদ্দল, ভালো মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে।' যা হবার নয় তাই হল। ইস্পাতের গুলির মতোই শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু-ফোঁটা জল।

ফিরে এসে বিমল জগদ্দলকে গ্যারেজের বাইরে বেলতলায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। পেছন ফিরে আর তাকাল না। সোজা গিয়ে উঠোনে বসে পড়ল— সামনে রাখল দু-বোতল তেজালো মহুয়া।

একটি চুমুক সবে দিয়েছে, শোনা গেল কে ডাকছে— 'বিমলবাবু আছ?' গোবিন্দের গলা।

গোবিন্দ এল, সঙ্গে একজন মারোয়াড়ি ভদ্রলোক।

— 'আদাব বাবুজি।'

— 'আদাব, কোন্ গাড়ির এজেন্ট আপনি?' বিমল প্রশ্ন করল। গোবিন্দ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল— 'গাড়ির এজেন্ট নন উনি; পুরনো লোহা কিনতে এসেছেন কলকাতা থেকে। তোমার তো গাদাখানেক ভাঙা অ্যাক্সেল রিমটিম জমে আছে। দর বুঝে ছেড়ে দাও এবার।'

বিমল খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। ভবিতব্যের ছায়ামূর্তি তার পরম ক্ষুধার দাবি নিয়ে, ভিক্ষাভাণ্ডটি প্রসারিত করে আজ দাঁড়িয়ে সম্মুখে। এমনিতে ফিরবে না সে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাই। বিমল কি ব্যাপারটা বুঝল!

— 'হ্যাঁ আছে পুরনো লোহা, অনেক আছে, কত দর দিচ্ছেন?'

— 'চোদ্দ আনা মণ বাবুজি' মারোয়াড়ির ব্যগ্র জবাব এল। — 'লড়াই লেগেছে, এই তো মৌকা, ঝেড়েপুঁছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজি।'

— 'হ্যাঁ সব দেব। আমার ওই গাড়িটাও। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।'

হতভম্ব গোবিন্দ শুধু বলল— 'সে কী গো বিমলবাবু?'

নেশা ভাঙল এক ঘুমের পর। তখনো রাত, বিমল আর এক বোতল পার করে শুয়ে পড়ল।

ভোর হয়ে এসেছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বিমলের। বাইরের জাগ্রত পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল উপচে একটি শুধু শব্দ বিমলের কানের কাছে আছড়ে পড়ছে— ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। মারোয়াড়ির লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ি টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোনো অন্তহীন নৈঃশব্দের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তার পরই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে উপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে— ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং— জগদ্দলের সমাধি খনন চলছে। যেন কোদাল আর শাবলের শব্দ।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841800144408